হিন্দুধর্মের আকীদা-বিশ্বাস

সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাস

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়-এ উল্লেখ আছে। "সৃষ্টির প্রথমে ভগবান লোকসমূহ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। ইচ্ছা হওয়ামাত্রই তিনি মহৎ-তত্ত্ববাদিসম্পন্ন পুরুষরূপ গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে দশ ইন্দ্রিয়, মন আর পঞ্চভূত- এই ষোলটি করা ছিল।।১।।

তিনি যখন কারনার্ণবে শায়িত হয়ে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁর নাভিহ্রদ থেকে এক পদ্মের সৃষ্টি হলো, এবং সেই কমল থেকে প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন।।২।।

ভগবানের সেই বিরাটরূপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যেই সমস্ত লোকের কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর সেই রূপ বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় সত্তবময় শ্রেষ্ঠ রূপ।।৩।।

যোগীগণ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভগবানের সেই রূপ দর্শন করেন। ভগবানের সেই রূপে অসংখ্য পদ, উরু, হস্ত ও মুখ থাকায় তা অতিশয় আশ্চর্যজনক, তার মধ্যে অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য কর্ণ, অসংখ্য চক্ষু ও অসংখ্য নাসিকা রয়েছে এবং সেই রূপ অসংখ্য মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডলাদি অলংকারে শোভিত।।৪।।

ভগবানের সেই পুরুষরূপ, যাকে নারায়ণ বলা হয়, অনেক অবতারের অক্ষ বীজস্বরূপ-এখান থেকেই সকল অবতারের প্রকাশ। এই রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দ্বারা দেবতা, পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদি দেহের সৃষ্টি হয়।।৫।। ইত্যাদি।[১]

স্রষ্টা সম্পর্কে বিশ্বাস

হিন্দুরা একজনকেই ঈশ্বর মানে, তবে তার শক্তিকে বিভিন্ন জনের কাছে ভাগ করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়ে আসেন। যেমন:

সৃষ্টিকর্তা ঃ

ব্রহ্মা হিন্দুধর্মের্র প্রধান তিন দেবতার একজন; অন্য দুজন বিষ্ণু ও শিব। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা 'প্রজাপতি' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ঋগ্বেদসহ বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে ব্রহ্মার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনন্তশয্যায়শয়ান বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে তাঁর প্রকাশ। তিনি বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত এবং সাধারণত চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ ও হংসবাহনরূপে কল্পিত। তিনি উন্নত দেহের অধিকারী এবং তাঁর গায়ের রং রক্তাভ গৌরবর্ণ। তাঁর চার হাতে থাকে কমন্ডলু, গ্রক্, ঘৃতপাত্র বা পুস্তক এবং অক্ষমালা। বিবাহের লগ্নপত্রে, সূতিকাগৃহে, শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে এবং বাস্তুপ্রতিষ্ঠার সময়ব্রহ্মাকে স্মরণ করা হয়।

কুম্ভকারের চক্রে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ব্রহ্মার পূজা হয়। এছাড়া বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও ব্রহ্মাপূজার আয়োজন করা হয়। পূজার স্বাভাবিক উপকরণের সঙ্গে বিশেষভাবে লাল ফুলের ব্যবস্থা থাকে। এ পূজার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই এবং পূজার সময়ঢাক বাজানো হয়না। উপমহাদেশের বাইরেও চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে ব্রহ্মার ভাস্কর্য লক্ষিত হয়।[২]

ঈশ্বরের একটি রূপ ব্রহ্ম। ব্রহ্মারূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করা তাঁর কাজ। বিশ্বের সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। তার হাতে জলপাত্র, স্রক (মালা) মৃতপাত্র এবং জপমালা থাকে। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সকল শুভ কাজে ব্রহ্মার উদ্দেশে পূজা দেয়া হয়। হিন্দু বিবাহের লগ্নপত্রে, সূতিকাগৃহে, শিশু জন্মের ষষ্ঠদিনে, বাস্তব প্রতিষ্ঠার সময় ব্রহ্মাকে স্মরণ করে পূজা দেয়ার রীতি ব্যাপক।

পালনকর্তা

বিষ্ণু (সংস্কৃত: विष्णु) হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা। আদি শংকর প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিতদের মতে, বিষ্ণু ঈশ্বরের পাঁচটি প্রধান রূপের অন্যতম। আবার তৈত্তিরীয়শাখা ও ভগবতগীতা আদি শ্রুতিশাস্ত্রে তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, বিষ্ণু সমগ্রনামে বিষ্ণুকে পরমাত্মা ও পরমেশ্বর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁকে সর্ব জীব ও সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত সত্ত্বা; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তথা অনাদি অনন্ত সময়ের প্রভু; সকল অস্তিত্বের গ্রষ্টা ও ধ্বংসকারী;

---

[১] -শ্রীমদ্ভাগবত মহাপূরাণ ১/৩/১-৫

[২] [সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিশ্বচরাচরের ধারক, পোষক ও শাসক এবং বিশ্বের সকল বস্তুর উৎসপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাণ অনুসারে, বিষ্ণুর গাত্রবর্ণ ঘন মেঘের ন্যায়নীল (ঘনশ্যাম); তিনি চতুর্ভূজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী। ভগবতগীতা গ্রন্থে বিষ্ণুর বিশ্বরূপেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতারেরও বর্ণনা রয়েছে। বিষ্ণুর এই দশ প্রধান অবতারের মধ্যে নয়জনের জন্ম অতীতে হয়েছে এবং এক জনের জন্ম ভবিষ্যতে কলিযুগের শেষলগ্নে হবে বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। বিষ্ণু সহস্রনামে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উক্তিতে বিষ্ণুকে "সহস্রকোটি যুগ ধারিনে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ, বিষ্ণুর অবতারগণ সকল যুগেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ভগবতগীতা অনুসারে, ধর্মেরপালন এবং দুষ্টের দমন ও পাপীর ত্রাণের জন্য বিষ্ণু অবতাররূপ ধারণ করেন। হিন্দুদের প্রায়সকল শাখাসম্প্রদায়ে, বিষ্ণুকে বিষ্ণু বা রাম, কৃষ্ণপ্রমুখ অবতারের রূপে পূজা করা হয়।

হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তি ধারণায়ব্রহ্মাকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির প্রতীক, বিষ্ণুকে স্থিতির প্রতীক ও শিবকে ধ্বংসের প্রতীক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ মতে, ত্রিমূর্তির এই তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর পূজাই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে ভগবান বিষ্ণুই সর্বোচ্চ ঈশ্বর। ভগবান বিষ্ণু থেকেই ব্রহ্মা এবং শিবের উৎপত্তি।[৩]

ধ্বংসকর্তা

শিব

শিব হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও সংহার এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতারূপে পরিচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর শিব ধ্বংস করেন। এই সৃজন-পালন-সংহার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জগৎসংসার চলমান আছে।

শিব অনার্য দেবতা, অর্থাৎ আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর দেবতা ছিলেন শিব। তিনি খুব প্রভাবশালী ছিলেন, তাই আর্যসমাজে তাঁর স্থান হয়েছে। বেদে তিনি রুদ্র নামে উল্লিখিত হয়েছেন। এই রুদ্রই পরবর্তীকালে শিব বা মহাদেব নামে বহুল পরিচিতি লাভ করে।

শিবের সঙ্গে সমাজের একেবারে সাধারণ মানুষের নিবিড়সম্পর্ক দেখা যায়। তাঁর পার্ষদরা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁর নিজের চলাফেরা, কাজকর্ম এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও কৌলীন্যের ছাপ নেই। তাঁর পরিধানে ব্যার্ঘচর্ম ও মৃগচর্মের উত্তরীয়, মাথায়জটা, গলদেশে সর্পের উপবীত এবং হাতে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে জানা যায়যে, দারিদ্র্যের কারণে তাঁকে ভিক্ষাও করতে হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়তিনি প্রাচীন ভারতের একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি অল্পতেই রুষ্ট, আবার অল্পতেই তুষ্ট হন। এজন্য তাঁকে ভোলানাথও বলা হয়। তাঁর মধ্যে একটি শিশুসুলভ কোমল মন লক্ষ করা যায়। কারও দুঃখকষ্ট এবং আবেদনে তিনি অতি সহজেই সাঙা দেন। তাই তাঁর বরে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি অসুর অত্যাচারী হয়েউঠলে শেষে ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতির হাতে তারা নিহত হয়। কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন মোহ নেই। পুরাণাদির বর্ণনায়দেখা যায়শিব একা নন; তাঁর দাম্পত্য জীবনের সঙ্গিনী হচ্ছেন সতী (পরে পার্বতী, উমা বা দূর্গা); কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁদের পুত্রকণ্যা। শিবের এই সংসার-জীবনের সঙ্গে বাঙালির সংসার-জীবনের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালির জামাই-মেয়েযেমন শ্বশুর বাড়বেড়াতে যায়, তেমনি শিব-পার্বতীকেও দেখা যায়শ্বশুর বাড়িবেড়াতে যেতে। এমনটি অন্য কোন দেবতার ক্ষেত্রে দেখা যায়না।

শিব জগতের কল্যাণের জন্য অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। যেমন সমুদ্রমন্থনে উত্থিত তীব্র বিষ কণ্ঠে ধারণ করে তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। এতে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়েগেলে তাঁর নাম হয়নীলকণ্ঠ। ত্রিপুর নামক অসুরকে বধ করায়তাঁর নাম হয়ত্রিপুরারি। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিবের আরও অনেক নাম হয়। যেমন সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ বলে তিনি মহাদেব। তাঁর প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল, তাই তাঁর এক নাম শূলপাণি। পিনাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে তাঁর অপর নাম হয়পিনাকী। সকল ভূত (জীব)-এর ঈশ্বর বলে তিনি ভূতনাথ বা ভূতেশ নামেও পরিচিত।

শিবের ধ্বংসকারী অস্ত্রের নাম পাশুপত। প্রলয়কালে তিনি বিষাণ ও ডমরু বাজিয়েসব কিছু ধ্বংস করেন, তাই তাঁর অপর নাম মহাকাল। তবে ধ্বংস থেকেই আবার নতুন সৃষ্টির শুরু বলে শিবকে মঙ্গলের দেবতাও বলা হয়। তিনি

---

[৩]উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে।

একাধারে মহাযোগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও কঠোর তপস্যাকারী। তাঁর তপস্যাস্থল হিমালয়। কৈলাস তাঁর আবাস ভূমি। ধ্বংসের সময়তিনি যে তান্ডব নৃত্য করতেন তা আধুনিক নৃত্যকলার একটি অঙ্গ। এজন্য তিনি নটরাজ নামেও খ্যাত। নৃত্যশিল্পীদের নিকট তাঁর নটরাজ মূর্তি উপাস্য দেবতার মতো। তাঁর অপর নাম আশুতোষ, যেহেতু তিনি অল্পতেই তুষ্ট হন। ভক্তিভরে শুধু একটি বিল্বপত্র দিলেই তিনি খুশি। তবে তাঁর আত্মসম্মানবোধও কম নয়। শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞস্থলে স্বামী নিন্দায়ক্ষুব্ধ সতী দেহ ত্যাগ করলে শিব দক্ষযজ্ঞ লন্ডভন্ড করে দেন। তিনি যখন শোকোন্মত্ত অবস্থায়সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে নিয়েনৃত্য করছিলেন, তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়েসতীর মৃতদেহ খন্ড-বিখন্ড করে ফেলেন। সেই খন্ডগুলি ভারতের যে যে স্থানে পতিত হয়, সে সে স্থান ৫১টি পীঠ ও ২৬টি উপপীঠ বা তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শিব স্বয়ং ঈশ্বররূপে বন্দিত হয়েছেন। এছাড়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায়তাঁর কাহিনী নিয়েঅনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবখন্ডে শিবের কাহিনী একটি আবশ্যিক বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। শিবের গাজন এক সময়ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসব ছিল। বর্তমানেও কোন কোন অঞ্চলে এ উৎসব পালিত হয়। হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস-ভক্তিতে আজও শিবের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ। ভারতের ন্যায়বাংলাদেশেও শিবচতুদর্শী তিথিতে ভক্তগণ শিবরাত্রিব্রত উদ্যাপনসহ শিবলিঙ্গে অর্ঘ্য নিবেদন করে এবং কোথাও কোথাও এ উপলক্ষে মেলাও বসে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শিবের মন্দির রয়েছে।

পর্যালোচনা:

১. আপনারাই দেখলেন একজন মানুষ যিনি বিবাহ করেছেন। ছেলে মেয়ে জন্ম দিয়েছেন। শশুর বাড়ি গিয়েছেন। ইত্যাদি। এমন লোক আবার প্রভু হয় কীভাবে?

২. শিবই যদি ধ্বংসকর্তা হয় তাহলে তিনি দুনিয়াতে আসার আগে কে ধ্বংস করতো?

৩. শিবই যদি ধ্বংসকর্তা হন তাহলে তাকে কে ধ্বংস করলো?

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ হলেন এমন এক সত্তা, যিনি এক, তার কোন সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। রক্ষাকর্তা, ধ্বংসকর্তা সবকিছু তিনিই। আর তিনিই হলেন আল্লাহ্।

অতএব আমরা হিন্দু ভাইদেরকে দাওয়াত দিব যে, শিবের এই ক্ষমতা, আল্লাহ্র পরিচয় দিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিব।[৪]

পুনর্জন্মের বিশ্বাস

হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে, জীবের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্বের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত জীবকে বার বার এই পৃথিবীতে আসতে হয়। প্রতিবারেই নতুন শরীর হয়, কিন্তু শরীর জীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু শরীরের ভেতর যে আত্মার বা শক্তির 'বাস', সেটা তাজা থাকে। ব্যবহারের জীর্ণ দেহটিতে বের হয়ে কিছুকাল সূক্ষ্মজগতে বাস করে পুনরায় এই পৃথিবীতে নতুন শরীর ধারণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের জবানীতে বলা হয়েছে যে ''হে অর্জুন, এই জন্মের পূর্বে তুমি আমি অনেক জন্ম পার হইয়া আসিয়াছি। আমি তাহা জানি, তুমি জানো না। জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ও মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম।" হিন্দুধর্মের এই মৌল বিশ্বাসের সূত্রে যে, হিন্দুরা মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে পশু-পাখি ইত্যাদির রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করতে ফিরে আসে, পূর্বের জন্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। যদি সে পূর্বের জন্মেভালো কাজ করে থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। অন্যথায় সাপ, বিচ্ছু, পশু-পাখি ইত্যাদি রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করবে।

পুনর্জন্মের মতবাদ বেদের মধ্যে নেই। পরবর্তীতে 'পুরাণ' এর মধ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুনর্জন্মের বিশ্বাসে এ কথাই বুঝতে চাই যে, মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলো পিতা থেকে পুত্র এবং পুত্র থেকে তার পুত্রের মধ্যে স্থানান্তরিত হতে থাকে। মূলত পূনর্জন্মের মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে, এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য। মহানআল্লাহতা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টির পর তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখেননি। অভিশপ্ত শয়তান প্রথমে ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। ধর্মের নামে দলিত ও নিজ সম্প্রদায় 'শূদ্রদের সেবা গ্রহণকারী ও তাদেরকে নিচু জাত সাব্যস্তকারী' ধর্মের ঠিকাদারদের কাছে যখন তারা জানতে চাইলেন, আমাদের সৃষ্টিকর্তা একজন,

তিনি যেহেতু নাক, কান, চোখ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমাদেরকে একই রকম বানিয়েছেন, তাহলে আপনারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদেরকে নিচুজাত বানালেন কেন? ধর্ম ব্যবসায়ীরা তখন নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে পূনর্জন্মের দোহাই দিয়ে এই ফর্মূলা তৈরি করে দিলেন যে, 'পূর্বের জীবনের কর্মফলই তোমাদেরকে নিচু বানিয়ে দিয়েছে।' তখন থেকে এই মতবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদের দৃষ্টিতে সমস্ত আত্মা পূনঃসৃষ্টি হয়ে কর্মফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে আবার পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করে, মারাত্মক অন্যায়কারীরা উদ্ভিদ (বনস্পতি) রূপে পূনর্জন্ম লাভ করে এবং সৎকর্মশীলরা পূনর্জন্মের চক্র থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

পুনর্জন্ম মতবাদের বিরুদ্ধে তিনটি প্রমাণ

১. পূনর্জন্মের অসারতা প্রমাণে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো– পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের তথ্যমতে, ভূপৃষ্ঠে সবার আগে সৃষ্টি হয়েছে উদ্ভিদ। এরপর জীব-জন্তু। তার আরো লক্ষ-কোটি বছর পর মানুষের অস্তিত্ব। তখন পর্যন্ত যেহেতু মানুষের জন্মই হয়নি, কোন আত্মা পাপ কর্ম করেনি। তাহলে কোন আত্মা কোন পাপের ফলে ওই সব উদ্ভিদ এবং জীব-জন্তুরূপে সৃষ্টি হয়েছে?

২. পূনর্জন্মের মতবাদ বিশ্বাস করলে আবশ্যিকভাবে একথাও মানতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠের প্রাণীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কারণ, যে সকল আত্মা পূনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পেয়েছে-সেই পরিমাণ প্রাণীর সংখ্যাও হ্রাস পাওয়ার কথা। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত পৃথিবীর মানুষ, জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদ এর সংখ্যা অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়েই চলছে।

৩. পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী ও মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যায় আসমান-জমিন পার্থক্য। মৃত্যুবরণকারী মানুষের তুলনায় জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি। কখনো কখনো লক্ষ-কোটি মশা-মাছিসহ পৃথিবীজুড়ে অজস্রনাম না জানা প্রাণী জন্মলাভ করে, অথচ বাস্তবে মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা হয় অনেক কম। তাহলে এতসব মশা-মাছি কার আত্মার রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসে?

শিশুদের সম্পর্কে অনেক সময় শোনা যায় যে, পূর্বজন্মে যেখানে সে বসবাস করতো সেই জায়গা সে চিনতে পারছে, তার পূর্বের নাম বলে দিচ্ছে এবং পুনর্জন্মের কথা বলে দিচ্ছে; এগুলো শয়তান ও ভূত-প্রেতের কারসাজি। মানুষের দ্বীন-ঈমান ধ্বংস করার জন্য এরা শিশুর মাথায় প্রবেশ করে আবোল তাবোল কথা বলে। মরণের পর মানুষ প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরে যায় এবং দুনিয়ার কর্মফল হিসেবে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে; এই প্রকৃত সত্যটি মৃত্যুর পর সবার সামনেই উন্মোচিত হবে।

কর্মের প্রতিদান মিলবে

যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে ও সৎপথে চলে, সে জান্নাতে (স্বর্গে) যাবে। জান্নাত হলো এমন পবিত্রতম স্থান, যেখানে আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিলাসিতা এবং বিনোদনের এমন সব উপকরণ সেখানে আছে, 'যা দুনিয়ায় কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কারো কর্ণ শোনেনি এবং কারো অন্তরে সে সবের কল্পনাও করেনি। স্বর্গ তথা জান্নাতের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হবে স্বচক্ষে মহান মালিকের দর্শন'। এর চেয়ে আনন্দের এবং খুশির আর কিছুই হতে পারে না।

আর যারা মন্দকর্ম করে, অসৎপথে চলে এবং মালিকের নির্দেশ অমান্য করে তারা জাহান্নামে যাবে। অনন্ত আগুনে জ্বলবে। সব পাপাচারের শাস্তি তাকে দেয়া হবে। সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে মহান মালিকের প্রিয় দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়া। তারা মালিকের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।